পৃথিবীর গাড়িটা থামাও : সলিল চৌধুরী

সুব্রত রায়চৌধুরী

আধুনিক কাব্যবাণীতে বাঙালির কানকে তৃপ্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেই উনিশ শতকেই, বিশ শতকের রবীন্দ্রগানে ছিল কাব্যময় অনুভূতির নিবিড় আবেদন, সে আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত , অতুলপ্রসাদের মতো প্রতিভাবান অনুবর্তী সম্প্রদায়। রবীন্দ্রনাথের মতোই এঁরা শুধু গানের বাণী রচনা করলেন না, তাতে তাঁরা সুরও বসালেন, তাই বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল নতুন একটি ধারা এর নাম দেওয়া যেতে পারে কাব্যগীতি। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে রজনীকান্ত-এঁরা সকলেই ছিলেন কাব্যগীতিকার। সুর সংযোজনায় খানিকটা স্বাতন্ত্র্য থাকলেও গীতরচনায় এঁরা অনেকটাই রবীন্দ্র সমধর্মী। এই রবীন্দ্র বলয়ে উল্কার মতো প্রবেশ করলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর ওজস্বী ভাষা, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর কিংবা বিপরীতক্রমে রোমান্টিক অনুভূতিময় কবিকল্পনা, সূক্ষ্ম আবেগের সাঙ্গীতিক ইমেজ ব্যবহারের রীতি গীতিকার রবীন্দ্রনাথকে অনায়াসেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসল বিশ শতকের তৃতীয় দশকেই। কবিতার জগৎ থেকে তিনি সরে গেলেন গানের জগতে। প্রায় তিন হাজারেরও বেশি গান লিখে ফেললেন তিনি। গানের জগতে পূর্বতনের সমস্ত ধারাবাহিকতা, ঐতিহ্যকে ভেঙেচুরে তিনি নতুন কাব্যবাণী রচনা করলেন। শুধু তাই নয় তাতে নানা রাগাশ্রয়ী সুরও সংযোজন করে এক নতুন কাব্যবাণী রচনা করলেন — যা রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র এবং অনেকাংশেই অতিক্রমী ফলে বিংশ শতাব্দীর বিশ-ত্রিশের গীতিকবিরা নতুন কাব্যবাণীর স্বাদ পেলেন নজরুলের গানে। বাংলা গানে নতুন আধুনিকতার জন্ম হল। রবীন্দ্রসংগীতের সমান্তরাল ধারায় তাই বইতে শুরু করল নজরুলগীতি। শুধু তাই নয় নজরুলের গানের ভাষা, প্রেমময় আকুলতা, প্রকাশের সৌকর্য, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, হৃদয়কথা প্রকাশের আকুলতা নানা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের ব্যবহার পরবর্তী গীতিকারদের সৃজনভূমিকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করেছিল। ফলে রবীন্দ্রসংগীত প্রিয় শ্রোতার সংখ্যা ক্রমশ বাড়লেও রবীন্দ্রসংগীত নতুনতর গীতিকারদের আর তেমনভাবে টানতে পারল না। এখানেই জিতে গেলেন নজরুল। দেখা গেল বেশ

কিছু সুরকার যেমন নজরুলের গীতরীতিকে অনুসরণ করছেন তেমন বেশ কিছু গীতিকারও নজরুলের কাব্যভাষাকে ব্যবহার করছেন অনায়াসেই। সুর ও বাণী উভয় ক্ষেত্রেই নজরুল সংগীত সুধায় আপ্লুত হয়ে সেদিন তরুণ প্রজন্মের যাঁরা কলম ধরেছিলেন তাঁরা প্রথম জীবনে হয়তো অসাবধানেই নজরুল বলয়ে পা রেখেছিলেন। তাই তাঁদের কাব্যভাষায় বা সুরারোপিত কথায় কখনো কখনো নজরুলের প্রতিধ্বনি শোনা গেল। যেমন প্রণব রায়েরই (১৯০৮) এই গান দুটি,

চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয়
আমার সমাধি পরে

কিংবা

সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে
এসেছি ভুলে

অথবা সুবোধ পুরকায়স্থের (১৯০৭) কাব্যভাষাটিও লক্ষ্য করা যায়,

সেদিন নিশীথে বরিষণ শেষে
চাঁদ উঠেছিল বনে
আমি মুগ্ধ আবেশে তোমারে দেখিনু
নিরজন বাতায়নে

কথা ও সুরের বন্ধনে গানগুলিতে নজরুল স্পন্দন অনুভব করা যায়, ফলে এই সময়ের অনেকের গানকেই শ্রোতা কখনো বা শিল্পীও নজরুল সংগীত হিসাবে ভুল করে বসেন। অবশ্য উত্তর তিরিশ পর্বেই এই সব নবাগত গীতিকারেরা বাঙালি শ্রোতার হৃদয় লুঠ করে নিলেন। নজরুল সংগীতকে পাশে সরিয়েই শ্রোতারা চিনতে পারছিলেন অজয় ভট্টাচার্য (১৯০৭), সুবোধ পুরকায়স্থ (১৯০৭) প্রণব রায় (১৯০৮) পবিত্র মিত্র (১৯১৮), মোহিনী চৌধুরী (১৯২০) শ্যামল গুপ্ত (১৯২২) -এর মতো নবাগত গীতিকারদের। তবে তাঁদের গানের বিষয়, ভাষা, চিত্রকল্প এতটাই আত্মমুখী বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে সুরের বৈচিত্র্য ও উপস্থাপনায় প্রাণময় আবেদন থাকলেও তা ক্রমশই ব্যবহারে জীর্ণ কিংবা ক্লিশে হয়ে উঠছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাস এঁদের গান সম্পর্কে লিখেছেন,

> বাংলা আধুনিক গানে তখন কাব্য ছিল, আর ছিল ঐতিহ্যমন্ডিত সুরের আবেদন। কিন্তু তা ত্রিশোত্তর মধ্যবিত্তের ব্যর্থ বাসনার আত্মকেন্দ্রিকতায় ঘুরপাক খাচ্ছিল (ভূমিকা, সলিল চৌধুরীর গান)[১]

এমন সময় আধুনিকতার গুমোট আসরে আচমকা 'কোন এক গাঁয়ের বধূ' নিয়ে এল বাংলার প্রান্তরের ঘর জুড়ানো হাওয়া। সে হাওয়া নিয়ে এলেন সলিল চৌধুরী (১৯.১১.১৯২২ — ৫.৯.১৯৯৫)

উত্তর তিরিশ বা চল্লিশের দশক নানা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক

টানাপোড়েন বেসামাল এক উত্তাল দশক। নানা কৃষক, শ্রমিক আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ এইসময় বিপর্যস্ত করে তুলেছিল বাংলার জনজীবন। এই বিপন্ন বাংলার কথা সেদিন শোনাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সেকালের গীতিকারেরা। শুধু গীতিকারেরাই নয় সেকালের মঞ্চও সেদিন নতুন নাটকের জন্য নতুন নাট্যকার কলাকুশলীদের অপেক্ষায় ছিল। এমনকি শিশির ভাদুড়ী সমর্থিত বিখ্যাত নাট্যপত্র 'নাচঘর' পত্রিকাতেও লেখা হয়েছিল,

> নাট্যমন্দিরে এখন প্রতি রাতেই পুরাতন নাটকের পর পুরাতন নাটকের স্রোত। — এটা যে নবযুগের নতুনত্বের পরিচয় নয়, আশা করি শিশিরবাবু নিজেই সেটা না মেনে পারবেন না।... আমরা চাই নতুন নাটক, নতুন ভাব, নতুন পরিকল্পনা। [১]

নতুন ভাব, নতুন পরিকল্পনা, নতুন কথা, নতুন সুর চাইছিলেন সেদিন বাংলার মানুষ। এই যুগ বাস্তবতাকে মেনেই সলিল চৌধুরী লিখেছিলেন,

> আজ নয় গুনগুন গুঞ্জন প্রেমের
> চাঁদফুল জোছনার গান আর নয়
> ওগো প্রিয় মোর খোল বাহুডোর
> পৃথিবী তোমারে যে চায়।

সলিল চৌধুরী একটি সাক্ষাৎকারে সন্ধ্যা সেনকে একথাই বলেছিলেন,

> বিদেশী শাসকের পীড়ন দুর্ভিক্ষ এক ফোঁটা ফ্যানের জন্য মানুষের কাতর আর্তনাদ — আমার মনে হলো এই পরিবেশে প্রেম-প্রিয়া নিয়ে গান লেখা ও গাওয়াটা শুধু অবাস্তব নয়, অপরাধ।

এই অপরাধবোধই বাঁশিওয়ালা সলিল চৌধুরীকে গীতিকার সলিল চৌধুরীতে রূপান্তরিত করেছিল।

সলিল চৌধুরীর জন্ম ১৯২২-এর ১৯ নভেম্বর। বাবা জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন আসামের চা বাগানের ডাক্তার। সেই সূত্রে খুব ছোটবেলাটি কেটেছে আসামে। বাবা গানবাজনায় পারদর্শী ছিলেন। নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। চা বাগানের সাহেবদের কাছ থেকে সিম্ফনি মিউজিকের অনেক রেকর্ড সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সঙ্গে বাড়িতে বাজত পঙ্কজকুমার মল্লিক, ইন্দুবালা, আঙুরবালার নানা রেকর্ড। এসব শুনতে শুনতেই সলিল চৌধুরীর কান প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই সাংগীতিক পরিবেশ থেকে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটে ১৯৩৩-এ। কিন্তু সাংগীতিক পরিমন্ডলটি বদলে গেলেও সাংগীতিক পরিবেশ থেকে তিনি নির্বাসিত হন নি। ২১ নং সুকিয়া স্ট্রিটের ছোটকাকাদের বাড়িতে ছিল একটি অর্কেস্ট্রার দল। নাম ছিল মিলন পরিষদ এই পরিবেশে মাত্র একবছর ছিলেন সলিল চৌধুরী। কিন্তু এই একবছরেই বিভিন্ন যন্ত্র বাজাতে শিখে গেলেন তিনি। বিশেষত হারমোনিয়াম, পিয়ানো ও বাঁশের বাঁশি বাজাতে তিনি অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠলেন।

১৯৩৪-এ চলে গেলেন কোদালিয়ায় মামার বাড়িতে। এখানে সুকিয়া স্ট্রিটের অবাধ স্বাধীনতা ছিল না, অন্যদিকে পরিবেশটিও ছিল গানবাজনার পরিপন্থী। সলিল চৌধুরী লিখেছেন,

> ... প্রথম প্রথম গাঁয়ে এসে সবচেয়ে যার অভাব বোধ করতাম তা গানবাজনার। আমার মামার বাড়ির সঙ্গে ঐ জিনিসটার ছিল ভাসুর - ভাদ্দর বৌ সম্পর্ক [৩]

তবে সম্পর্কের সে আড়াল ভেঙে দিলেন মাসি আর মাসতুতো বোনেরা। "বাঁশি বাজাতে পারি শুনে এরাই প্রথম দাদুদের নিষেধের শক্ত তালা ভেঙে দিলেন। গান আর বাঁশি চলত অনেক রাত পর্যন্ত।" সেই থেকে বাঁশি হয়ে উঠল সলিল চৌধুরীর সুখ দুঃখের সাথী। কলেজে পড়ার সময়ে বাইজির নাট্যদলে বাঁশি বাজিয়ে সংসারও সামলেছেন। আবার বঙ্গবাসী কলেজের কনসার্টেও যোগ দিয়েছিলেন বাঁশি হাতে। স্থানীয়ভাবে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন সেখানেও তিনি ছিলেন বাঁশিওয়ালা। বাঁশি বাজিয়েই মুগ্ধ করেছেন সবাইকে।

গানবাজনার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও শুরু করেছিলেন, কিন্তু সে সব কথা সময়ের স্রোতে ভেসে গেছে। কিছু কথা সমকালের কিছু মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকলেও তাঁরাও আজ অনেকে হারিয়ে গেছেন, ছেলেবেলার বন্ধু রঘু চক্রবর্তী সলিল চৌধুরীর ১৫ বছর বয়সের একটি লেখার কথা উল্লেখ করেছেন

> বসেছিনু পূর্ণিমা রাতে
> নিরালা শয়ন পাতি
> এলে না গো প্রিয়তম
> নিশিভোর হল জাগি [৪]

বাঁশিওয়ালা সলিল চৌধুরীর এমন অসাধারণ কাব্যসংগীতের শ্রোতা ছিলেন তাঁর মা এবং বাড়ি ও পাড়ার মহিলামহল। কিন্তু সলিল চৌধুরীর কাব্যসংগীতের এ ভাষা বদলে গেল ১৯৩৮ থেকেই। দেখা গেল প্রেমের রোমান্টিক ভুবন থেকে সরে এসে সলিল চৌধুরী গীতিকার হিসাবে পা রাখলেন বাস্তবের মাটিতে। তবে তাঁর কাব্যসংগীতের দক্ষতা এবং অন্তমিল রক্ষা করার আশ্চর্য ছান্দসিক ক্ষমতা তাঁর গানকে সাবলীল করে তুলেছিল।

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে সোনারপুর অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন সলিল চৌধুরী। তিনি তখন বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ছাত্র আন্দোলনে যান নি। বরং খেপুদা (খগেন রায়চৌধুরী) হরিধন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে জমিদার-জোতদার বিরোধী কৃষক আন্দোলনেই অংশ নিয়েছেন। পার্টির জেলা নেতা নিত্যানন্দ চৌধুরী তাঁর সৃজনশীলতাকে অনুভব করেই তাঁকে আন্দোলনের উপযোগী গান লেখার পরামর্শ দেন। সলিল চৌধুরী তাঁর এই উৎসাহকে ব্যক্তিগত আলাপচারিতাতেও স্মরণ করেছেন। তপনকুমার বসুকে জানিয়েছেন,

> প্রত্যেকটা মিটিংয়ের আগে তিনি বলতেন সলিল একটা গান লেখো। তাঁর উৎসাহেই আমি

গণ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেক গান লিখেছি, সুর দিয়েছি। প্রত্যেকটা মিটিংয়ের জন্য একটা করে গান রাতারাতি তৈরি করে পরের দিন মিটিংয়ে ছোট দল নিয়ে হারমনিয়াম নিয়ে গাইতাম। কাজেই গণনাট্য সংঘ হবার আগেই আমি কিন্তু এ ধরনের কাজে নেমে পড়েছিলাম। যাকে গণনাট্য আন্দোলনের ধারাই বলা যায়।"

সলিল চৌধুরীকে বলা যায় নজরুলগীতি ও গণসংগীত ধারার সূচনা মুহূর্তের মধ্যবর্তী গীতিকার। স্বাদেশিক ধারা যেখানে আন্তর্জাতিক ভাবনার মহাসঙ্গমে গিয়ে মিশেছে— সেই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম। আন্তর্জাতিক ভাবনা ত্রিশোত্তর যুগে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক নতুন সংগ্রামী চেতনা ও আবেগের জন্ম দিল। এই জন্ম মুহূর্তের বার্তা প্রতিধ্বনিত হল গণসংগীতে। ইতিপূর্বের দেশাত্মবোধক সংগীতে জাতীয় চেতনা, পরাধীনতার জ্বালা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকলেও মজুর কৃষকের শোষণমুক্তির বাণী ছিল না। সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন নজরুল ইসলাম। বলা যায় গণসংগীতের প্রথম সার্থক রূপকার তিনি। তিনিই প্রথম বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণির প্রিয়তম গান 'আন্তর্জাতিক' বাংলায় অনুবাদ করেন 'People's Flag is deepest Red'. অনুবাদ করে লেখেন 'উড়াও উড়াও লাল নিশান' গানটি। আবার ১৯২৬-এ লেখেন সেই বিখ্যাত গান,

ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল
ধর হাতুড়ী, তোল কাঁধে শাবল (শ্রমিকের গান)

এমনকি 'ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল' - এই 'চাষীর গান'-এর মাধ্যমে তিনিই প্রথম বাঙালি শ্রোতাকে শুনিয়েছেন সর্বহারার বিশ্বচেতনায় পৌঁছবার সংবাদ, এই উত্তরাধিকারই সলিল চৌধুরী তুলে দিলেন গণনাট্যের হাতে।

সোনারপুরে বিদ্যাধরী নদী মজে যাওয়ায় কৃষকদের হাজার হাজার একর আবাদি জমি বঙ্গোপসাগরের লোনা জলে মজে যেত। ড্রেজার দিয়ে নদী কাটাবার দাবীতে এবং কৃষকদের রিলিফের দাবিতে কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতৃত্ব। সেদিন খেপুদার কথায় সলিল চৌধুরী লিখলেন,

দেশ ভেসেছে বানের জলে
ধান গিয়েছে মরে
কেমনে বলিব বন্ধু
প্রাণের কথা তোরে।

১৯৪৫ সাল, বঙ্গবাসী কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র রংপুরে গিয়েছেন ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে। তখন আন্দামান ফেরত আসা বন্দিদের এবং আই. এন. এ বন্দিদের বিচারের কথা চলছে। তার বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠছে দেশবাসী। ক্ষোভে আক্রোশে ফেটে পড়ছে যুবসমাজ। রঙপুরের সেই ছাত্রসম্মেলনে সলিল গাইলেন নিজের লেখা সেই বিখ্যাত

গান,

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে সেই জনতা।

মাত্র সতেরো-আঠারো বছরের তরুণ সলিল চৌধুরীর এই গান সেদিন গোটা দেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। গানটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ছাত্র নেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায়। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ করেছিল গানটি। সলিল চৌধুরী এই গানটিকেই তাঁর লেখা প্রথম গণসংগীত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যদিও গণসংগীত নামটি তখনও প্রচলিত হয় নি। ১৯৪৬ সাল, গোটা দেশে ডাক-তার ও রেল ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। বক্তা বীরেশ মিশ্রের সঙ্গে গোটা আসামের নানা জায়গায় গান গেয়ে ধর্মঘটের প্রচার করেছেন সলিল চৌধুরী। অবশেষে ২৯ শে জুলাই মনুমেন্টের নিচে লক্ষ লক্ষ মানুষের মিটিং-এ সলিল চৌধুরী গাইলেন তার লেখা নতুন গান,

ঢেউ উঠছে কারা টুটছে আলো ফুটছে প্রাণ জাগছে
ঢেউ উঠছে কারা টুটছে আলো ফুটছে প্রাণ জাগছে, জাগছে, জাগছে
... ...
শোষণের চাকা আর ঘুরবে না, ঘুরবে না
চিমনিতে কালো ধোঁয়া উঠবে না, উঠবে না
... ...
লাখে লাখ করতালে হরতাল হেঁকেছে — হরতাল
আজ হরতাল, আজ চাকা বন্ধ।

সলিলের গানের এই বাণী আমাদের বার বার নজরুলকে মনে করিয়ে দেয়। সলিল যেন গোটা ভারতবাসীর পক্ষ থেকে বিদেশী শাসককে হুঁশিয়ার করে দিলেন শোষণের চাকা আর ঘুরবে না।

এই চরম পত্র দেবার এক পক্ষকালের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল বীভৎস দাঙ্গা, ১৯৪৬- এর ১৫ আগস্ট ভাতৃরক্তে লাল হয়ে গেল বাংলার মাটি। গোটা শহরাঞ্চল জুড়ে যে সংগ্রামী আবহাওয়ার জন্ম দিয়েছিল লড়াকু মানুষ সলিল-সংগীত তাতে খানিকটা বিপর্যস্ত হল। তাই সম্প্রীতি রক্ষায় কলম ধরলেন সলিল। আসামের বিহু গানের সুরে কথা বসিয়ে লিখলেন 'ও আমার দেশবাসী রে/ আয়রে রহিম ভাই, আমার পরাণ ভাই/ কালো নদী কে হবি পার। দুই সম্প্রদায়ের মাঝে যে রক্তনদী বয়ে চলেছিল সেখানে সলিল চৌধুরী সুরের সাঁকো তৈরি করে দিলেন সেদিন।

বিপর্যস্ত মানুষকে আবার সঠিক পথ দেখাতে কমিউনিস্ট পার্টি তখন কৃষকদের নিয়ে তেভাগা আন্দোলন গড়ে তুললেন। এই সময় ১৯৪৬-এ কাকদ্বীপ তেভাগা আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনে জোয়ার এনেছিল সলিল সংগীত। একুশ বছরের তরুণ সেদিন যে গান বাঁধলেন তার ভাষায় তেভাগা আন্দোলনের মূল কথাগুলো

তিরের ফলার মতো ছুটে গিয়ে আন্দোলনকারীদের হৃদয়কে বিদ্ধ করল। সুরের সফিস্টিকেশন ভেঙে গিয়ে এ গান ইতিহাসের অতীত থেকে সরে এসে নতুন প্রজন্মের হাত ধরল। এ গান তাই আজও মাঠ ময়দানে গাওয়া হয়ে থাকে,

হেই সামালো ধান হো
কাস্তেটা দাও শান হো
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেব না আর দেব না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো

শুধু তেভাগা আন্দোলনই নয়, নানা গণ আন্দোলনের মুহূর্তে সলিল লিখেছিলেন অসংখ্য গণ সংগীত। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বেআইনি করার প্রতিবাদে তিনি লিখলেন, 'আমার প্রতিবাদের ভাষা, আমার প্রতিরোধের আগুন'। কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৮ -এ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে লিখলেন, 'না, মানব না এ বন্ধনে, মানবো না এ শৃঙ্খলে'। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অসম্পূর্ণতাকে শ্লেষোক্তি করলেন এই ভাবে— 'নাকের বদলে নরুন পেলুম টাক ডুমা ডুম ডুম/ আর জান দিয়ে জানোয়ার পেলুম লাগলো দেশে ধুম'

সলিলের গণসংগীত ক্রমেই কালের সীমানা পেরিয়ে মহাকালের সহযাত্রী হয়ে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র বা বিশেষ কোনো সময় সীমায় দাঁড়িয়ে সলিলের কাব্যভাষা কথা বলে না। তা গোটা দেশ নয়, গোটা পৃথিবীর খেটে খাওয়া মানুষের স্বপ্ন ও কল্পনাকে আমাদের সামনে তুলে ধরল। একটা জাতির চিরন্তন সংগ্রাম, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, নতুন জীবনের জন্য অপেক্ষা, সে অপেক্ষার রঙ সলিলের কাব্যভাষার ক্যানভাসে নানা সময় ফুটে উঠেছে। স্বর্ণযুগের উদ্বোধনী সংগীতও এই গণনাট্যের ছায়াতলে বসেই রচনা করেছিলেন সলিল। 'কোনো এক গাঁয়ের বধূ'র কথায় ভেঙে ফেলেছেন স্থায়ী অন্তরার বাঁধা ছক। ১৩৫০-এর মন্বন্তরক্লিষ্ট দুর্গত গ্রাম জীবন ও সে জীবনের প্রতিনিধি হিসাবে 'গাঁয়ের বধূ' গানে একটি কাহিনি সূত্র রচনা করল। তুমি-আমির পরিচিত ছকের বাইরে দাঁড়িয়ে সলিল গতানুগতিক প্রতিবন্ধকতা থেকে সরে এলেন। এই নতুনত্বের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন বাঙালি শ্রোতা। কবি সলিল চৌধুরীর সামাজিক দায়বদ্ধতা বাঙালি পাঠক শ্রোতাকে দিল নতুন বাস্তবতার সন্ধান। দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যাওয়া পাঁচঘড়া গ্রামের পটভূমিতে লেখা এই গানটি সম্পর্কে সলিল চৌধুরী বলেছেন

> বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা বলেই ওই গান মেলোড্রামা বর্জিত। প্রেমের ন্যাকামি বা প্যানপ্যানানি থেকে মুক্ত। প্রতিবাদ থেকে সংগীত পেয়েছে একধরনের বলিষ্ঠতা।[৬]

তবু এ গান (গাঁয়ের বধূ) তখনকার গণনাট্যের আসরে নিষিদ্ধ হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পাল্কীর গানকেও' নিষিদ্ধ করা হল। আসলে শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ ধ্যান ধারণার অভাব ছিল কমিউনিস্ট পার্টির অন্দর মহলে। পার্টি লাইনকে মান্যতা দিয়ে পার্টি

সংগঠিত আন্দোলনকেন্দ্রিক শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা করাই ছিল রীতি। ফলে শ্লোগানধর্মী গানের কথা, গান, নাটক তৈরি হতে লাগল। এতে মৌলিক শিল্পীদের শিল্পী সত্তা বিপর্যস্ত হল। সলিল চৌধুরী এই জাতীয় সংকীর্ণতার বিরোধিতা করেছেন। সৃষ্টিকে সমকালের গন্ডী ছাড়িয়ে মানুষের চিরকালের সংগ্রামের সাথী করে তুলতে চেয়েছেন। মনে রাখতে হবে এই কারণে ঐ একই সময় গণনাট্য সংঘের ছায়া থেকে সরে এসে গড়ে উঠেছিল গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন। এই বিপন্নতাবোধ থেকেই সলিল চৌধুরী লিখেছিলেন,

> আমি বুঝতে পারছিলাম চূড়ান্ত বাম বিচ্যুতির মধ্যে শিল্পী হিসাবে দম আটকে মরা ছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর নেই।[৭]

তবু সলিল চৌধুরী কৃষক আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত গান 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে/ধান দেব মেপে' এইচ. এম. ভি থেকে প্রকাশিত গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন শ্রীমতি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটির কথাগুলিও এ আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। সলিল চৌধুরী লিখেছিলেন,

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে
আয় রিমঝিম বরষার গগনে
কাঠ ফাটা রোদের আগুনে
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয় রে।

হায় বিধি বড়ই দারুণ
পোড়া মাটি কেঁদে মরে ফসল ফলে না
হায় বিধি বড়ই দারুণ
ক্ষুধার আগুন জ্বলে আহার মেলে না।

এই গানে উচ্চারিত 'বিধি' শব্দটিতে আপত্তি তুলেছিলেন, তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির শিল্প-সংস্কৃতির ধারক বাহকেরা। তাঁরা মনে করেছিলেন 'বিধি' শব্দটি ব্যবহার করে সলিল চৌধুরী ভগবানে আস্থা রেখেছেন। এই ভাবনা নিরীশ্বরবাদী কমিউনিস্ট ভাবনার পরিপন্থী। সলিল চৌধুরী জানিয়েছেন,

> সংস্কৃতি নেতারা ঘোষণা করলেন এটি একটি প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার ফসল। ওটা গণনাট্যে গাওয়া তো যায়ই না বরং এই ধরনের গীত রচনার জন্য একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। আপত্তি হল প্রধানত 'বিধি' এই কথাটি ব্যবহারের জন্য। ... কমিউনিস্ট শিল্পী হয়ে ভগবানের নাম নেওয়া কেন ?[৮]

বেশ বোঝা যায় পার্টির ভেতরেই দৃষ্টিভঙ্গীগত কারণে একটি সলিল বিরোধী মঞ্চ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সলিলেরও পার্টি সম্পর্কে ক্রমে মোহমুক্তি ঘটছিল। পারিবারিক অবস্থাও বিপন্ন। তবু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের শান্তি সম্মেলন থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেন নি সলিল চৌধুরী। মানবিক দায়বদ্ধতার কারণেই কলকাতার শান্তি সম্মেলনে (১৯৫১) গণনাট্যের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েই তিনি গাইলেন

নিজের কথায় নিজের সুরে,

যখন প্রশ্ন ওঠে ধ্বংস কি সৃষ্টি
আমাদের চোখে জ্বলে আগুনের দৃষ্টি
আমরা জবাব দিই সৃষ্টি সৃষ্টি সৃষ্টি
যখন প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ কি শান্তি
আমাদের বেছে নিতে হয় নাকো ভ্রান্তি
আমরা জবাব দিই শান্তি শান্তি শান্তি

গণনাট্যের জন্য এটাই সলিল চৌধুরীর লেখা শেষ গান। এর পরেই পারিবারিক বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। ১৯৫১ সালের ৫ মে মারা গেলেন সলিল চৌধুরীর বাবা। পার্টি ও গণনাট্যের প্রতি মোহমুক্তি আগেই ঘটেছিল সেই সঙ্গে বাবা মারা যাওয়ায় যুক্ত হল আর্থিক অনটন। পারিবারিক দায়বদ্ধতাও চেপে বসেছিল। বাংলার শিল্প সংস্কৃতির এ এক সংকটময় কাল। এই মুহূর্তেই এসে পৌছল বম্বে থেকে বিমল রায়ের আহ্বান। ভূমিহীন কৃষকের রিকশাওয়ালা হবার কাহিনির স্ক্রিপ্ট নিয়ে ১৯৫২ তে বম্বে চলে গেলেন সলিল। তৈরি হল চলচ্চিত্র। গণনাট্য ও পার্টি তার ব্যাখ্যা দিল এই ভাবে, 'সংস্কৃতি আন্দোলনের পিছনে ছুরি মেরে সলিল চৌধুরী কেরিয়ার বানাতে বোম্বে গেছে।' এইখানেই শেষ নয় যাঁর হাত ধরে গণনাট্য সংঘ সেদিন মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে গিয়েছিল সেই সলিল চৌধুরীর পার্টি মেম্বারশিপটা পর্যন্ত বাতিল করে দিল তাঁরা। শুরু হল আলোর পথের যাত্রী সলিল চৌধুরীর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই নতুন অধ্যায়ে পৌছালেও সলিল চৌধুরী নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে দেখেছেন এই দিনগুলিকে। সমস্ত অপূর্নতার কথা মনে রেখেও তাঁর সংগীত জীবনে গণনাট্যের অবদানকে পরবর্তীকালে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে বলেছেন,

> তবু একথাও ঠিক আমার শিল্পী জীবনের এক মূল্যবান অধ্যায় সৃষ্ট হতে পেরেছিল গণনাট্য আন্দোলনের দৌলতে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত যে বিচিত্র সংস্কৃতির ভান্ডার যুগ যুগ ধরে মানুষকে জীইয়ে রেখেছে - তার সঙ্গে পরিচিতিও ঘটেছে প্রধানত সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মেলনগুলির মধ্য দিয়ে।[১]

গণসংগীত রচয়িতাদের মধ্যে সলিল চৌধুরীর অগ্রজ ছিলেন বিনয় রায় ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। সমকালের শিল্পীদের মধ্যে হেমাঙ্গ বিশ্বাসও উল্লেখযোগ্য। তবে বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ধারা এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের ধারা ঠিক এক নয়। বিনয় রায় কিংবা হেমাঙ্গ বিশ্বাসেরা গানের কথায় স্থানীয় কথ্য ভাষাকে মিশিয়ে তার একটি আঞ্চলিক রূপ দিতেন। সলিলের মনে হয়েছিল এতে দেশের সর্বত্র সে গান হয়ত গৃহীত হবে না বরং তিনি ভেবেছিলেন যাত্রাপালা ও অপেরার ভাষা এবং সংগীতের সঙ্গে পরিচয় থাকায় তাঁর গানে ব্যবহৃত মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথ্য ভাষা বুঝতে দেশের যে কোনো প্রান্তের গ্রামের মানুষেরই অসুবিধা হবে না। তাই সেই ১৯৪৫ থেকেই তিনি মধ্যবিত্তের কথ্যভাষাই গণসংগীত রচনায় ব্যবহার করেছেন। তবে কিছু গ্রামীণ শব্দ প্রয়োজন মতো মিশিয়েও নিয়েছেন। সলিলের গণসংগীতগুলি ভালো করে পড়লে বা শুনলে গঠনগত কয়েকটি

বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। গণসংগীত হল বিদ্রোহ বিপ্লব জাগরণের গান। শোষণমুক্তির জন্য শৃঙ্খল অস্বীকারের গান। এই ভাবনাটি শ্রোতার মনের গভীরে পৌঁছে দিয়ে দৃঢ় প্রত্যয় গড়ে তোলবার জন্য কবি সলিল চৌধুরী একই ধরনের শব্দ, শব্দগুচ্ছ বা বাক্য বারবার ব্যবহার করেন। যেমন,

মানব না এ বন্ধনে/ মানব না এ শৃঙ্খলে
কিংবা আর পারবে না ভোলাতে মধু মাখা ছুরিতে
আর পারবে না ভোলাতে মরীচিকা মায়াতে
অথবা যখন প্রশ্ন ওঠে ধ্বংস কি সৃষ্টি
আমরা জবাব দিই সৃষ্টি সৃষ্টি সৃষ্টি

জীবনের ইতিবাচক দিকটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি। তাই তাঁর ব্যবহারে বা চিত্রকল্প-প্রতীক নির্বাচনে তিনি এমন কিছু শব্দ প্রতীক বা চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন যাতে অনায়াসেই শ্রোতা অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই তার অর্থ খুঁজে নিয়ে জীবনের সেই সদর্থক দিকটিকে উপলব্ধি করতে পারেন। 'জনতা' 'জনগণ' শব্দগুলি আজ বহু ব্যবহারে জীর্ণ, কিন্তু ৪০/৫০ এর দশকে এই শব্দগুলিকে কবি গীতিকারেরা অনায়াসেই ব্যবহার করেছেন। যেমন 'সেই সমুদ্র উত্তাল জনতা তরঙ্গ কে রোখে' বা 'সেই নিপীড়িত জনগণের পায়ের ধারে', কিংবা 'আজ দিকে দিকে জনগণ তৈয়ার'। 'সিন্ধু', 'তরী', ' বন্যা', 'জোয়ার', 'তরঙ্গ', 'সূর্য', 'প্রভাত', 'সোনার ধান', 'সোনালী প্রান্তর' এ জাতীয় ইতিবাচক শব্দগুলি কবি সলিল চৌধুরী বারবার ব্যবহার করেছেন। শব্দ ব্যবহারের এ জাতীয় রীতি সেকালে সম্ভবত সলিলই প্রথম বাংলা গানের ভাষায় ব্যবহার করলেন। সলিল শুধু প্রয়োগ রীতিতেই নতুনত্ব আনলেন না নতুন কাব্যভাষাও রচনা করে নিলেন, 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা' গানটির তৃতীয় স্তবকটি একালের প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিক হলেও আরো একবার পড়ে দেখা যেতে পারে। কবি সলিল চৌধুরী লিখলেন,

তারা ক্ষুদিরামের রক্তবীজে প্রাণ পেয়েছে
তারা জালিয়ানের রক্তস্নানে প্রাণ পেয়েছে
তারা ফাঁসির কাঠে জীবন দিয়ে প্রাণ পেয়েছে
তারা গুলির ঘায়ে কলজে ছিঁড়ে প্রাণ পেয়েছে

এখানে 'রক্তবীজে', রক্তস্নানে', 'কলজে ছিঁড়ে' প্রভৃতি শব্দ বা শব্দ গুচ্ছ একান্তই সলিলের নিজস্ব সৃষ্টি। এগুলির ব্যবহারের মধ্য দিয়েই সলিল চৌধুরীর গানকে নজরুলের উত্তরসূরী এক কবিকে পৃথকভাবে চিনে নেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 'নাকের বদলে নরুণ পেলুম' গানটির কথাও ভাবা যায়। সলিল তাঁর গানের ভাষায় লোক সংগীতের ঘরানা ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রেও বাংলা কবিতায় তাঁর একটি নিজস্বতা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, 'তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি' গানটির এই কটি পংক্তি,

যেমন থাকে আন্ধার দেশে
সিঁথির সিন্দুর রেখা
আন্ধার মেঘে জ্বলে যেমন
বিজুলীর রেখা

এখানে 'আন্ধার দেশে'। 'সিঁথির সিন্দুর', 'আন্ধার মেঘে' কথাগুলি লোক আবহাওয়া রচনা করেছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে নিচের গানটির ভাষাও,

হেঁইয়ো হো হো হেঁইয়ো /ও মাঝি বাইয়ো
কিংবা হেই সামালো, হেই সামালো
হেই সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও শান হো

গানগুলি লোকসংগীত নয়, লোক সংগীতের আদলে লেখাও নয়, অথচ অদ্ভুতভাবে লোক সংগীতের পরিচয় বহন করে।

সলিলের গণসংগীতে শিল্পী বা শ্রোতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের জীবন যন্ত্রণা, আশা- আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরলেন। বাংলা কবিতার জগতে এতদিন ধরে যে পাঠক ও কবির মধ্যে দূরত্ব ছিল সলিল চৌধুরী সেই দূরত্ব মুছে দিলেন তার কাব্যভাষায়। জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়েই তিনি জনতাকে সম্বোধন করলেন এই ভাবে,

ও মোর দেশবাসীরে/আয় রে পরাণ ভাই আয়রে রহিম ভাহ
কিংবা আয়রে আয় কাটি ধান/ জমিনের রাখি মান/ হুশিয়ার, হো কিষাণ
অথবা আয়রে ও আয়রে/ ভাইরে ও ভাইরে

গনণাট্য থেকে সরে এসে চলচ্চিত্র ও ব্যবসায়িক সংগীত জগতে পা রাখলেন সলিল চৌধুরী। কিন্তু মনে রাখতে হবে পার্টি ও গণনাট্যের নেতৃত্বের প্রতি মোহভঙ্গ হলেও কমিউনিজমের ভাবাদর্শ তাঁর মধ্যে থেকেই গিয়েছিল। কৃষক শ্রমিক আন্দোলন ও অসহায় মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়ে গণনাট্যের মঞ্চে শিল্পী জীবনের প্রথম অধ্যায় কাটাবার ফলশ্রুতিতে উত্তরপর্বের গানের ভাষাতেও সলিল মানব মুক্তির কথা উচ্চারণ করেছেন নানাভাবে। পাঠকের মনে পড়তে পারে 'একদিন রাত্রে' ছবির 'জাগো মোহন প্রীতম' গানটির অন্তরার কথা,

আকাশে বাতাসে শোন মুক্তির বন্ধন
কিসেরই দ্বিধা আজি কিসেরই এ ক্রন্দন
দুঃখ বিমোচন জাগো ভয় ভঞ্জন

কখনওবা রূপকথার সাতভাই চম্পার কাহিনি বলতে বলতে কবি সলিল পৌঁছে যান ৪০-এর দশকে। 'সাত ভাই চম্পা'-র স্মৃতি তখন আমাদেরও কঠিন বর্তমানকে চিনিয়ে দেয় এই ভাবে,

আর রাজবাড়ি সাতরানী মায়ের ঘরে
ফিরে যাব না যাব না যাব না রে
ঘরে ক্ষুধার জ্বালা পথে যৌবন জ্বালা
রাজার কুমার আর আসে না ঘোড়ায় চড়ে।

কী অসাধারণ কাব্যভাষা। রূপকথা-রোমাঞ্চের জগৎ পেরিয়ে কবি যেন আমাদের পৌঁছে দেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের তেলেনাপোতায় যেখানে অপেক্ষায় আছে পল্লিজননী আর তার মেয়ে। কিন্তু অপেক্ষা শুধু দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় কারণ 'রাজার কুমার আর আসে না ঘোড়ায় চড়ে'। কখনো কখনো দৃপ্ত ভঙ্গিতে সলিল যেন গণনাট্যের মঞ্চেই উঠে দাঁড়িয়ে রুখে দাঁড়াতে বলেছেন অপমানিত মানুষকে। পাঠকের মনে পড়তে পারে সলিলের লেখা সেই বিখ্যাত গান 'এমনি চিরদিন তো কভু যায় না।' নির্বাচনের নামে প্রহসন সেদিন মানুষ মেনে নেয়নি। মানুষের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করতে পারেনি ১৯৭৩-এর শাসকগোষ্ঠী। গানটির শেষের অংশে কবি লিখলেন,

এবারে চিত্ত তোমার মুক্ত করো
দুই নয়নে অগ্নি জ্বালো
আর না তারে সিক্ত করো
দুই পায়ে হয়ে খাঁড়া
একবার ফিরে রুখে দাঁড়া
জীবন গেল খেয়ে তাড়া
তোমার শোভা পায় না।

এই গানগুলিতে গণনাট্য সংঘের ভাবনা আদর্শের অনুরণন যেমন শোনা যায় তেমনি গণনাট্যের সঙ্গে যখন তার নিবিড় যোগ ছিল, সে সময় রচিত কিছু গানের কথায় তার ব্যক্তিমন, অনুভূতিকেও আমরা খুঁজে পাই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় সে সব গান আজও আমাদের মনের গভীরের গোপন দরজা খুলে দেয় 'ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম, আমার ঠিকানা', কিংবা 'পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি' অথবা 'শ্যামলবরণী ওগো কন্যা'— গানগুলির বাণী ও সুর সলিল চৌধুরীর। কিন্তু কে আমাদের বেশি দোলা দিয়ে যায় তা যেমন ভাবায়, তেমনি এই গানগুলি গণনাট্যের যুগে লেখা একথা জেনেও আমরা বিস্মিত হই, সলিল চৌধুরী এই গানগুলি সম্পর্কে লিখেছেন,

> গণনাট্য আন্দোলনের একেবারে অন্তরঙ্গে অন্তঃস্থলে থাকাকালীনও এমনি বহু গান আমি লিখতাম যেগুলি ছিল আমার ব্যক্তিগত গান — অর্থাৎ গণসংগীত নয়, অথচ গণআন্দোলনে লিপ্ত ছিলাম বলেই বোধহয় সে সব গান লেখা সম্ভব হয়েছিল।[১৫]

সলিল চৌধুরী তাঁর কিছু গানকে ব্যক্তিগত গান আখ্যা দিয়েছেন। সম্ভবত এই পর্যায়ের একটি বড় অংশই হল তাঁর প্রেমসংগীত। ব্যক্তিগত গানের দ্বিতীয় পর্যায়টিতে রয়েছে ভালোমন্দ, আশা নিরাশা, আঘাতে- যন্ত্রণায় আন্দোলিত দ্বন্দ্বময় তাঁর ব্যক্তি আমির কথা। গানগুলি কখনো কখনো ছায়াছবির প্রয়োজনে সিচুয়েশান নির্ভর হয়েছে, কখনো বা রেকর্ড কোম্পানির মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। হয়তো বাণিজ্যিক প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু বাণিজ্যিক প্রয়োজন থাকলেই যে প্রেম বিষয়টি কথা ও সুরে দানা বাঁধবে, কিংবা তাকে স্বতস্ফূর্তভাবে শ্রোতা গ্রহণ করবেন এমন নয়। ব্যক্তিক অনুভূতি গভীর ও গাঢ় না হলে প্রেম সংগীতে ভালোবাসার প্রদীপ জ্বলে না। চোখে চোখে কথা হলেই কবি লিখতে পারেন,

কেন কিছু কথা বল না
শুধু চোখে চোখে চেয়ে যা কিছু চাওয়ার আমার
নিলে সবই চেয়ে একি ছলনা
যত দূরে থাকো, শুধু চেয়ে চেয়ে থাকো
সে চাওয়ায় আমার আকাশ আমার বাতাস
ভরে রাখো, একি ছলনা।

পংক্তিগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের কি একবার মনে পড়বে না, রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত পংক্তিটি 'হেরি কাহার নয়ান রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?' — আমরা জানি ব্যক্তি জীবনে সলিল চৌধুরী একাধিক নারী সঙ্গ লাভ করেছিলেন। আত্মজীবনী 'জীবন উজ্জীবন'-এ সলিল চৌধুরী সেরকমই ইঙ্গিত দিয়েছেন। হয়ত সেই অভিজ্ঞতা ছিল বলেই প্রথম জীবনের স্মৃতিভূমিতে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছেন,

মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে
যার চোখ তাকে আর মনে পড়ে না
চেয়ে চেয়ে কত রাত দিন কেটে গেছে
আর কোনো চোখ তবু মনে ধরে না।

কার চোখের কথা বলেছেন কবি ? সেকি বেহুলা সুখিয়া? যার সঙ্গে আসামের এক প্রাগৈতিহাসিক গুহায় কবির দেখা হয়েছিল? যার কথা 'জীবন উজ্জীবনে' দীর্ঘ করে বলার জন্য ক্ষমা চেয়েও নিয়েছেন কবি, হয়তো বা, হয়তো বা নয়। অনেক নারীর চোখে আঁকা অধরা বনলতার চোখ, কিন্তু এ গানের শেষে কবি যখন বলেন,

যেতে যেতে গানখানি পিছে ফেলে গেছে
ছম্ ছম্ নূপুরের সকরুণ সুর
শিকলে বাঁধিতে তাঁরে চেয়েছিনু বুঝি
শিকল চরণে তার হয়েছে নূপুর
ধরার বাঁধনে সে তো ধরা পড়ে না।

তখন আমাদের সকল যুক্তি-শৃঙ্খলা ভেঙে গিয়ে এক অধরা মাধুরীতে মন ভ'রে ওঠে। অনুভবের গভীরে শুধু অনুরণিত হয়ে চলে 'শিকল চরণে তার হয়েছে নুপুর'।

সলিল চৌধুরীর প্রেমসংগীতগুলিতে প্রেমিক মনের উল্লাস, কখনো বা বিস্ময়, আবার কখনোবা মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথম প্রেমের উল্লাসে কবি যেমন বলেন,

পল্লবিনী গো সঞ্চারিণী
মন না দিয়ে আর পারি নি

তেমনি প্রথম প্রেমের ছোঁয়ায় মন যখন রঙিন হয়ে ওঠে, যখন চোখের সামনের প্রকৃতিও বদলে যায় ভালোলাগা আর ভালোবাসার মাতাল সমীরণে তখন কবি এই বদলে যাওয়া জীবনানুভূতিতে বিস্মিত হয়ে বলেন,

যদি নাম ধরে তারে ডাকি
কেন সবুজ পাতারা যে দেয় সাড়া
বনে বনে নব মঞ্জরী
কেন ফুলে ফুলে ভরে যায়

আমাদের মনে পড়ে যায় বৈষ্ণব কবির কথা, যেখানে তিনি বলেন 'নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো/ অঙ্গের পরশে কিবা হয়' [১১]

সলিল চৌধুরী বিস্মিত হৃদয়ে বৈষ্ণব কবির মতো অঙ্গের পরশের কথা বলেন নি বটে তবে প্রেমের মুগ্ধতার আবেশ তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন পাঠক বা শ্রোতার অনুভূতির জগতে। প্রথম প্রেমের আবির রাঙানো মন শুধু চেয়ে থাকে, আর তাঁর সেই না বলা চোখের ভাষা কথা বলে ওঠে সলিলের গানে,

যদি কিছু আমারে শুধাও
কি যে তোমারে কব নীরবে চাহিয়া রব
না বলা কথা বুঝিয়া লও

গণনাট্য, গণসংগীত থেকে এ ভাষা বহুদূরের। গণসংগীতকে যদি একালের ভাষায় জীবনমুখী গান বলতে হয় তবে এ গানের ভাষাকে কী বলব? এ ভাষা, এ কথাও কি জীবনের কথা নয়, এ-ও কি আমাদের এক অন্য- আমি-র কথা নয়। এ আমিকে অস্বীকার করেও কী জীবনের প্রদীপ জ্বালানো যায়। যদি যেত তাহলে ডাক্তার (পথের দাবীর সব্যসাচী) কী ভারতী আর অপূর্বকে নতুন জীবন রচনার জন্য মুক্তি দিতে পারত? সলিলের গানে সেই ব্যক্তি ভুবনের সংবাদ রয়েছে। মানব মুক্তির তীর্থভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেছেন মানুষের ইতিহাসে 'সমগ্রের সত্য' যেমন সত্য ব্যক্তির ছোটখাটো চাওয়া পাওয়া,

আশা-নিরাশার, দ্বন্দ্ব সংঘাতও তেমনই সত্য। শিল্পী জীবনের এই দ্বান্দ্বিক ভূমিতে দাঁড়িয়ে সলিল চৌধুরী কখনও কখনও ভীষণ একা হয়ে পড়েছেন, এক অসহায় বিষন্নতাবোধ তাঁকে গ্রাস করেছে। তাঁর বহু গানে এই নামহীন যন্ত্রণাকে আমরা লক্ষ্য করি। এ যন্ত্রণা কখনও প্রিয়জন ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণা, কখনও বা অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয় এই অনুভবজাত এক নিরাশ্রয় বিপন্নতার যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার কথাই ১৯৬০-এ লতা মঙ্গেশকর সলিলের সুরে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন,

ওগো আর কিছু তো নাই
বিদায় নেবার আগে তাই
তোমারই সুরে গাওয়া
এ গানখানি রেখে যাই

গানটির রেকর্ডিং-এর মুহূর্তটি স্মৃতিকথায় ধরে রেখেছেন আর এক সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। রেকর্ডিং-এর মুহূর্তে গানটি শুনছিলেন বিখ্যাত গীতিকার পবিত্র মিত্র। তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'পবিত্রদার মুখ থমথমে, ব্যথিত, বিচলিত'[১২]। ১৯৬০ থেকে ২০১৬—অর্ধশতাব্দী অতিক্রমের পরেও বাঙালি আজও তেমনিভাবে বিচলিত হতে হতে অন্তরাতে পৌঁছায়,

বরষা হয়ে তুমি আকাশ ভরে
হৃদয় মরুতে মম পড়েছ ঝরে
সরস করিয়া মোরে
যে ফুল ফোটালে ভোরে
এ মালা তারি রেখে যাই

গানটি শেষ হতে পবিত্র মিত্র বলেছিলেন,

> হোক না জীবন একটু বেহিসাবী। তাতে কি এলো গেলো, এই বেহিসাবী জীবন যদি এমন স্বর্গীয় সৃষ্টি করতে পারে, কি আপত্তি জীবনে বেহিসাবী হতে।[১৩]

তবে কী সলিল নিজেকে উইথড্র করে নিতে চাইছিলেন জীবন থেকে? কিংবা কোনো জীবনই তাকে সুখী করতে পারছিল না। ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল তাঁকে। এ সব ভাববার কারণ সলিলের গানে তাই বারবার আসছে বিদায়ের কথা - বলছেন

একদিন ফিরে যাব চলে
এ ঘর শূন্য করে, বাঁধন ছিন্ন করে
যদি চাহ যেও ভুলে

একই অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতাটিতেও,

এবার আমার সময় হল যে যাবার
বিদায় দেবার বিদায় নেবার

কিংবা মনে পড়তে পারে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া এই গানটির অন্তরাটুকু

এবারে ভাসাবো ভেলা
শেষ হয়ে এলো বেলা
আর কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি

বিদায় নেবার কথা প্রবলভাবে নানা গানে এলেও কবি কিন্তু বারবার এই পৃথিবীর ধুলো, মাটি, বাতাস, মানুষের মনের গভীরে বেঁচে থাকতেও চেয়েছেন। নিজের গানে, গানের সুরে, কথায় তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছেন আগামী পৃথিবীতে। তাই লতা মঙ্গেশকর যে গান শুরু করেছিলেন 'ওগো আর কিছু তো নাই' বলে সে গানের অন্তরায় পৌঁছে তিনি শোনালেন সলিলের সেই আকাঙ্ক্ষার কথা,

আজিকে আশার নদী
হুতাশে শুকালো যদি
এ হৃদিটুকু রেখে যাই

কিংবা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'এবার আমার সময় হল যে যাবার' গানটির অন্তরাটুকু গাইলেন এইভাবে,

যা কিছু পারি নি দিতে/ যা কিছু পারি নি নিতে
জীবন তরীর পালে/ স্মরণ তাহার লাগিবে আবার

আসলে কবি জানেন মহাকাল কবিকে তার সোনার তরীতে স্থান না দিলেও কবির সৃজনকথাকে বয়ে নিয়ে পৌঁছে দেন আগামীর হাতে। এই বিশ্বাসে তিনিও ভাবেন 'কিছু কিছু গান মোর মনেতে রাখবে'। হয়তো এই প্রত্যয় ছিল বলেই কবি বলতে পারেন,

আমি যাব ঝরণার ঝরঝর ছন্দে
মিলে যাব বকুল চামেলির গন্ধে
সৌরভ ছন্দে আনন্দে
তোমার সকল খুশির খেলায়
আমায় পাবে তোমার দলে

গানের এই কাব্যভাষা শুনতে শুনতে আমাদের মনের জানলা দিয়ে কি উঁকি দিয়ে যায় না 'তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি, সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি' এভাবেই রবীন্দ্রসংগীত থেকে সলিলসংগীত একটি সাংগীতিক পথ রচনা করেছিলেন

আমাদের পূর্বসূরীরা। সে পথে হাঁটতে হাঁটতে আমরা আজ চলে এসেছি অনেকটা দূর। গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে ক্যাসেট পেরিয়ে এসে আজ সিডির যুগও প্রায় শেষ হতে চলেছে। রাস্তার দুপাশে নতুন বনস্পতিরা ঝুরি নামাতে চাইলেও আগাছাও কম জমেনি। রক, র‍্যাম্পের যুগে সাধনার চেয়ে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি, চাষবাসও এখন অনেক সহজ, তাই প্রতিদিনই অসংরক্ষণের বা অবহেলার চোরাস্রোতে ভেঙে পড়ছে রবীন্দ্রসংগীত থেকে সলিলসংগীতের বাঁধানো সড়ক। রাজনৈতিক উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির বিপরীত স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে গণসংগীত শিল্পী ও কবি সলিল চৌধুরী আজ ইতিমধ্যেই অনেকটা ম্লান। প্রেমিক কবি সলিল আরও কিছুদিন বাঁচবেন তাঁর কলম ও সুরের জোরেই। কিন্তু আগাছা যেভাবে দ্রুত আমাদের রুচি বদলে দিয়ে চলেছে তাতে এখনই সলিল সংগ্রহশালা গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে মনে হয়।

শৈশব আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই শৈশবসংগীত সংগ্রহশালা থেকেই আজ খুঁজে নিতে হবে। প্রতিভার বিস্তার দেখে বিস্মিত হতে হয়। যে রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' লেখেন সেই রবীন্দ্রনাথকেই দেখেছি 'সহজ পাঠ' লিখতে। বহুমুখী প্রতিভার এই নানামুখী বিস্তার আমরা সলিল চৌধুরীর গানেও খুঁজে পাই। তিনি যেমন বাঁশি বাজান, আবার তেমনই হারমোনিয়ামও বাজান, বাজান পিয়ানো, অর্কেস্ট্রা, আবার কথায় কথায় সুর বসিয়ে ভাসিয়ে দেন সুরের বন্যায়, এই বহুমুখী প্রতিভার জন্যই তিনি যেমন গণনাট্যের জন্য গণসংগীত রচনা করতে পারেন, লিখতে পারেন অসংখ্য প্রেমের গান, তেমনই তিনি আবার শৈশব সংগীতও রচনা করতে পারেন। তারও শুরু সেই ৫০-এর দশকে,

ধিতাং ধিতাং বোলে, কে মাদলে তাল তোলে
কার আনন্দ উচ্ছলে আকাশ ভরে জোছনায়

১৯৫৪-তে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গানটি গেয়েছিলেন। এ সময়ের অন্য গানগুলির মধ্যে হেমন্ত মুখার্জীর কণ্ঠে 'দুরন্ত ঘূর্ণির (১৯৫৮), সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'গা গা রে পাখি গা' (৬৯), প্রভৃতি গানগুলির কথা মনে পড়ে। এ সময়ের লেখা 'হলুদ গাঁদার ফুল দে এনে দে', 'প্রজাপতি প্রজাপতি' প্রভৃতি গানগুলি সলিলকে সেরা শৈশবসংগীত রচয়িতার মর্যাদা দিয়েছে। সেই শুরু এর পর ৭০-৮০-র দশক পর্যন্ত শিশুমন নিয়ে সুরের সাগরে নিজের কথাকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। এই দিনগুলিতে সঙ্গে ছিলেন দুই কন্যা অন্তরা-সঞ্চারী আর ছিলেন সবিতা চৌধুরী। একের পর এক সলিল লিখলেন, 'বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে','এক যে ছিল মাছি', 'ও আয়রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে', কেউ কখনো ঠিক দুপুরে', খুকুমণি গো সোনা', 'হবুচন্দ্র রাজা', 'ছি ছি রানি রাঁধতে শেখেনি'-র মতো অসংখ্য গান। একসময় সত্যজিৎ রায় যে ছোটোদের গানের ভুবন রচনা করেছিলেন তাকে সলিল চৌধুরী সম্প্রসারিত করে দিলেন ৭০-৮০-র রাজনৈতিক উন্মাদনার মুহূর্তেও। এক বিপরীতধর্মী কনট্রাস্ট তৈরি করলেন তিনি, তাতে বাঙালি সেদিন খানিকটা স্বস্তি পেয়েছিল বৈকি। সলিলের এই শৈশব সংগীতগুলি সলিল গবেষণার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠতে

পারে।

কবি হিসাবে পরিচিত কিন্তু গীতিকারের ভূমিকা নিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছেন এ ধারার শেষ কবি নজরুল ইসলাম। নজরুলের পরেই বাঙালি গীতিকারেরা গীত রচনার একটি আলাদা ঘরানা তৈরি করে নিলেন। এ ধারাটিও এল রবীন্দ্রনাথেরই হাত ধরে। ফলে এই পর্ব থেকেই বাঙালি কবি ও গীতিকার আলাদা হয়ে গেলেন। সলিল চৌধুরী কোনোদিনই কবিতা লিখতে চাননি আবার প্রথাগত গীতিকার হবার ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। আসলে প্রতিভাবান মৌলিক শিল্পীরা প্রথা মানেন না, প্রথা ভাঙেন। ভাঙতে ভাঙতেই তাঁরা হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র একক। সলিল চৌধুরীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। তিনি যখন কাব্যচর্চায় এলেন তখন বাংলা কাব্য জগতে শঙ্খ, সুনীল, শক্তির মতো শক্তিমান কবিরা এসে গেছেন। এঁদের সঙ্গে, এঁদের কাব্যচর্চার সঙ্গেও সলিল ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অথচ তিনি তাঁদের ধারায় কবিতা লিখলেন না। অন্যদিকে অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়দের ধারাতেও গানের বাণী রচনা করলেন না। তাঁদের ব্যবহৃত স্থায়ী- অন্তরার রীতিকেও অস্বীকার করলেন। কখনো সুর রচনা করে তাতে কথা বসালেন। মাত্রাগত প্রয়োজনে কখনো সাধু কখনো চলতি কখনোবা লৌকিক শব্দ ব্যবহার করলেন। ফলে এক নতুন কাব্যভাষা তৈরি করে নিলেন তিনি। আবার কখনো বিষয় অনুযায়ী কথা রচনা করেছেন আগে। তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোমান্টিক বাক বিন্যাস, বা রোমান্সগন্ধী শব্দকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাই দেখি 'চোখ', 'পাখির' মতো কিছু শব্দ তাঁর গানের ভাষায় বারবার আসছে। আবার এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের চলমানতা ও সত্যাশ্রয়ী একাকীত্বের বিষয়টিও ফুটে উঠেছে। এই একাকীত্বের বেদনায় অভিমানী কবি কখনো কখনো হয়ে পড়েছেন ক্লান্ত, কখনোবা এই পৃথিবীকেই নিজের যোগ্য আবাসভূমি বলে আর ভাবতে পারেন নি। ছোট সুখ, ছোট কথা, ছোট দুঃখ ব্যথা প্রাপ্তি - অপ্রাপ্তি অতিক্রম করে সলিল চৌধুরী মহাকালের যাত্রী হতে চেয়েছেন। ১৯৭৮ সালে তিনি শুনিয়েছেন সে কথা একেবারে নতুন ভাষায়,

এই রোকো রোকো
পৃথিবীর গাড়িটা থামাও
আমি নেমে যাব
আমার টিকিট কাটা অনেক দূরের
এ গাড়ি যাবে না আমি অন্য গাড়ি নেব।
আমার স্বপ্নভরা লাগেজ নামাও
এই কুলি, মহাকাল, কাঁধে তুলে নাও
নিজেরই বৃত্তে ঘুরে ঘোরে না যে গ্রহ
সেই গ্রহ গাড়িটাতে তুলে নিয়ে যাও

এ ভাষা এক মহাজাগতিক ভাষা, এ ভাষার সঙ্গে শব্দগত মিল পাঠক খুঁজে পাবেন সমসময়ের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'যাব বহুদূর' কবিতায়। শক্তি লিখেছেন,

মালবিকা হাতে হাত রাখো আমি

মিলটুকু শুধু উচ্চারণেই, ভাবে ভাষায় সলিল অনেক বেশি আজকের কবি, এখানেই সলিলের নিজস্বতা। গীতভাষা আর কাব্যভাষা যে এক নয়, একথা সলিল অনুভব করেছিলেন বলেই 'এক হাজার মায়া, আর দুশো ভালোবাসা' অতিক্রম করে এ পৃথিবীর গাড়ি থেকে নেমে মহাকালের রথে চড়ে বসেছেন।

গ্রন্থঋণ:

১. সলিল থেকে সুমন এবং তারপর: অরুণ কুমার বসু
২. জীবন উজ্জীবন: সলিল চৌধুরী
৩. সলিল চৌধুরীর গান
৪. সলিল চৌধুরী- প্রথম জীবন ও গণসংগীত : সমীর কুমার গুপ্ত
৫. আলোর পথযাত্রী : সংকলন ও সম্পাদনা ধীরাজ সাহা
৬. পশ্চিমবঙ্গ, এপ্রিল, ২০০৫
৭. নন্দন, সলিল চৌধুরী স্মরণ সংখ্যা
৮. যুবমানস, নভেম্বর ২০০৫

উল্লেখসূত্র:

১. সলিল চৌধুরীর গান
২. নাচঘর পত্রিকা
৩. জীবন উজ্জীবন: সলিল চৌধুরী
৪. সলিল চৌধুরী- প্রথম জীবন ও গণসংগীত : সমীর কুমার গুপ্ত
৫. গণশক্তি- শারদ সংখ্যা
৬. সাক্ষাৎকার - নিয়েছেন অতনু চক্রবর্তী
৭. জীবন উজ্জীবন : সলিল চৌধুরী
৮. জীবন উজ্জীবন : সলিল চৌধুরী
৯. জীবন উজ্জীবন : সলিল চৌধুরী
১০. জীবন উজ্জীবন : সলিল চৌধুরী
১১. চন্ডীদাস
১২. আলোর পথ যাত্রী, পৃ : ৯
১৩. আলোর পথ যাত্রী, পৃ : ৯
১৪. উচ্ছ্বাস, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা